ভাষা আন্দোলন ও আজকের অনুভূতি

রফিকুল ইসলাম

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ তারপরেও ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ মোট সাত বছর ভাষা আন্দোলন চলেছিল রাজপথে, তারপর ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানে বাংলা ভাষা উর্দু ভাষার সঙ্গে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু শর্ত ছিল, বিশ বছর পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একটি কমিশন নিয়োগ করবেন, বিবেচনার জন্য যে বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে কি না! এত দিন ইংরেজি থাকবে রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে ফৌজি শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি অদৃশ্য হয়ে যায়। আইয়ুব খান প্রস্তাব করেন, বাংলা-উর্দু ভাষা মিশিয়ে একটি পাকিস্তানি খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টির আর পাকিস্তানের সব ভাষা রোমান হরফে লেখার। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের উর্দু ও বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬৩ সালে সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে যে সংবিধান চালু করেন তার মাধ্যমে নাগরিকদের ভোটাধিকার হরণ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী বা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রী শাসনতন্ত্রে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের 'জাতীয় ভাষা' ঘোষণা করা হয় আর বলা হয়, বিশ বছর পর প্রেসিডেন্ট নিয়োজিত কমিশন বিচার করে দেখবে যে, বাংলা ও উর্দু ভাষায় সরকারি কাজ চালানো যায় কি না। তত দিন ইংরেজিতেই সব চলবে। ষাটের দশকজুড়ে পূর্ব বাংলায় বাংলা প্রচলন আন্দোলন চলতে থাকে, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ইংরেজি। পূর্ব বাংলার ছাত্রছাত্রীরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে দিতে থাকে। ছাত্র ও যুবকদের ইষ্টকবর্ষণে পূর্ব বাংলার প্রায় সমস্ত দোকানপাট ও অফিসের নামফলক রাতারাতি ইংরেজি থেকে বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঢাকায় প্রথম সায়েন্স ল্যাবরেটরি রোডের একটি দোকানের বাংলা নামকরণ করা হয়েছিল, 'সাগর থেকে ফেরা'। গাড়ির নম্বর প্লেট প্রথম বাংলা করেন সাংবাদিক এবিএম মূসা, বাকি গাড়িগুলো ছাত্রদের ইষ্টকবর্ষণের ভয়ে রাতারাতি বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্র প্রথম শিল্পী সম্মানি 'বাংলা চেক'-এর মাধ্যমে দিতে থাকে, তদানীন্তন কর্মকর্তা জামিল চৌধুরীর উদ্যোগে। মোট কথা ১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষার প্রচলন হতে থাকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। উনসত্তরের গণআন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে বাংলা ভাষা বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হয়, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম চার-পাঁচ বছর জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার চালু হয়ে যায়। ব্যতিক্রম থাকে শুধু উচ্চ আদালত। বাংলা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সুবিধা পূরণ করে বাংলা একাডেমীর 'মুনীর অপটিমা' টাইপ রাইটার। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা মাধ্যম চালু হয়, ব্যতিক্রম ছিল শুধু চিকিৎসা ও প্রকৌশল শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা। ইতিমধ্যে কম্পিউটারে বাংলা সফটওয়্যার চালু করেন আনন্দ কম্পিউটারের মোস্তফা জব্বার, একাত্তরের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা। বাংলা একাডেমীর সাহায্যে সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীসহ সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীর 'কমান্ড' ব্যবস্থা বাংলা ভাষায় চালু হয়। যদিও স্বাধীনতার পর সরকার বাংলা ভাষার সাংবিধানিক মর্যাদাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট ভাষা পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করেনি, তবুও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ইতিহাসে এই প্রথম কয়েকটি বছর বাংলাদেশ বাংলা ভাষা ছাড়াই শাসিত ও পরিচালিত হয়, যার কৃতিত্ব ছিল সাধারণ মানুষের। কারণ সমাজের বিত্তবান শ্রেণী চিরকালই বাংলার শত্রু ও বিদেশী ভাষার ভক্ত। বাংলাদেশ সরকার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলা সেল' গঠনের মাধ্যমে সচিবালয় ও প্রশাসনিক পর্যায়ে পরিভাষা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে মোটামুটিভাবে প্রশাসনের ভাষারূপে প্রচলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই 'বিশ্বায়ন', 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' এবং 'আকাশ সংস্কৃতি' বিশ্বের প্রেক্ষাপট বদলে দেয়। পৃথিবীর দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যে 'স্নায়ু বা ঠাণ্ডা' যুদ্ধ চলছিল তার ফলে 'স্টারওয়ার' বা 'স্যাটেলাইট ওয়ার'-এর জন্য যে প্রস্তুতি চলছিল অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় তার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। স্টারওয়ার পরিণত হয় আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনে, পাশ্চাত্য দেশগুলো স্যাটেলাইট চ্যানেলের সাহায্যে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোর বিরুদ্ধে স্যাটেলাইট আগ্রাসন চালাতে শুরু করে, 'কেবল্ নেটওয়ার্কের' সাহায্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকৃত ও নগ্ন রূপ তৃতীয় বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলোর ঘরে ঘরে প্রেরিত হতে থাকে। ইনফরমেশন হাইওয়ের সম্প্রসারণে ইন্টারনেটের সাহায্যে পাশ্চাত্য ভাবনা-চিন্তার বিকিরণ চলতে থাকে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। একুশ শতকে বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাজনৈতিক

স্বাধীনতাকে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছে, মুক্তবাজার অর্থনীতি গরিব দেশগুলোর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আর উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতি তৃতীয় বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী জাতিগুলোর সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা সাহিত্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। বাংলাদেশে ওইসব উপসর্গ একুশের চেতনাকে আজ আনুষ্ঠানিকতা ও আচার সর্বস্বতায় পরিণত করেছে। বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা আন্দোলন, শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস– সবকিছু একুশ শতকে গালভরা কথা, কুম্ভিরাশ্রু এবং কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি সমান্তরাল ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। বাংলাদেশে এখন উচ্চবিত্ত বা ধনীদের সন্তানদের জন্য ইংরেজির মাধ্যমে মধ্যবিত্তের সন্তানদের জন্য বাংলার মাধ্যমে আর নিম্নবিত্তের সন্তানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা– এই ত্রিধারা প্রচলিত। বাংলাদেশের অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার কোনো প্রবেশাধিকার নেই। বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ শিক্ষার মূল ধারায় বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বাধ্যতামূলক, কিন্তু ১৪ বছরেও তাদের ইংরেজি লিখতে বা পড়তে শেখানো যাচ্ছে না। ইংরেজি ভাষা এখন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় ফেল করানোর প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও সাক্ষর করে তোলা যায়নি সেদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীকে পাশ্চাত্যের কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা চলছে! ইতিমধ্যে আমরা ভুলেই বসে আছি যে, মাতৃভাষা শেখাতে হয় তাই মাতৃভাষা এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে অনাদৃত ও উপেক্ষিত ভাষা, তাই দেশের পথ-ঘাটের, দোকানপাটের সব নামফলক আবার ইংরেজি হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস বিল আসছে ইংরেজিতে। সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন জন্মদিন, বিবাহ প্রভৃতির আমন্ত্রণপত্র রচনা ভুল-ভাল ইংরেজিতে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। মনে হয়, 'ইউনেস্কো' কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষিত হওয়ার পর বাংলা ভাষার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। শহীদ দিবস বা একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শহীদ মিনারে পুষ্প প্রদান আর একুশের বইমেলাতে সীমাবদ্ধ, অপরদিকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অশুদ্ধ ইংরেজি ও বাংলার ব্যবহার বাড়ছে, রোমান হরফে বাংলা নামফলক লেখা চলছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে আমরা যারা '৪৮ থেকে '৫২ এবং '৫২ থেকে '৫৫ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন দেখেছি বা করেছি, যারা ষাটের দশকজুড়ে বাংলা প্রচলন আন্দোলন করেছি, সত্তরের দশকের প্রথমার্ধজুড়ে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য প্রাণপাত করেছি তাদের কাছে শহীদ দিবসের আনুষ্ঠানিকতা ও আচারসর্বস্বতা নির্মম পরিহাস বলে মনে হয়। মনে হয় চারিদিকে শুধু শুনছি– 'মোদের গরব মোদের আশা, আয় মারি বাংলা ভাষা।'

ড. রফিকুল ইসলাম : ভাষাসৈনিক। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।